ক্ষণিকত্ববাদ

ভারতীয় প্রাচীন দর্শনগুলির মধ্যে অন্যতম বৌদ্ধ দর্শনে 'সৎ'-এর লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে - 'অর্থক্রিয়াকারিত্ব লক্ষণম্ সৎ' অর্থাৎ কোন কিছুর সত্তা বা আস্তিত্ব তখনই স্বীকার করা হবে যাখন তার মধ্যে কার্য উৎপাদন ক্ষমতা থাকবে। কারণ, বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতে যার কার্যোৎপাদন ক্ষমতা আছে তারই কেবলমাত্র অস্তিত্ব আছে। যেমন ঘট, পট ইত্যাদি। আর যার তা নেই তার অস্তিত্বও নেই। যেমন আকাশ-কুসুম, শশ-শৃঙ্গ ইত্যাদি।

'অর্থক্রিয়াকারিত্বলক্ষণম্ সৎ' - এই লক্ষণ থেকেই যে বৌদ্ধদের ক্ষণিকত্ববাদ অনুসৃত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। নিম্নের আলোচনা লক্ষ্য করলে তা আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারব।

ক্ষণিকত্ববাদের আলোচনা আমরা প্রাচীন ও নব্য উভয় বৌদ্ধদের ক্ষেত্রেই দেখতে পাই। তবে যুক্তি ও তথ্য উভয়ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক। প্রাচীন বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতে, আমরা অবিদ্যা বা অজ্ঞান প্রসূত যে সকল বস্তুর জ্ঞান লাভ করি তাদের অনেককে নিত্য বা শাশ্বত ও স্থায়ী বলে মনে করি। কিন্তু এটি আমাদের ভুল ধারণা। প্রকৃতপক্ষে, কালের অবিভাজ্য সূক্ষ্মতম অংশকে ক্ষণ বলে। এই ক্ষণই সৎ। সব কিছুই ক্ষণিক। (সর্বং ক্ষণিকম্)। বৌদ্ধদের মতে, স্থায়ীভাবে প্রতিভাত বস্তু আসলে অসংখ্য সদৃশ ক্ষণিক বস্তুরই প্রবাহ মাত্র। এই প্রবাহকে বৌদ্ধ পরিভাষায় 'সন্তান' এবং এর অন্তর্গত প্রতিটি ক্ষণ বা বস্তুকে 'সন্ততি' বলে। কোন একটি ক্ষণে একটি বস্তু জন্মানোর পরক্ষণেই তার সদৃশ একটি বস্তু সৃষ্টি করে সে বিনষ্ট হয়। কিন্তু দুটি ক্ষণের বস্তু অভিন্ন নয়। আসলে কতগুলি ক্ষণের একটি সমষ্টিকে আমরা স্থায়ীরূপে গণ্য করি। যদিও এই ক্ষণের প্রত্যেকটি প্রত্যক্ষের অতীত।

প্রাচীন বৌদ্ধগণ উপরোক্ত বক্তব্যের প্রমাণ বিভিন্ন দৃষ্টান্তের সাহায্যে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বলেন, আমরা অস্বীকার করতে পারি না, আমাদের প্রতিদিনের শারীরিক পরিবর্তন যা নিরন্তর হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটে চলেছে অর্থাৎ বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও বার্দ্ধক্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে শরীরের পরিবর্তন। লক্ষণীয়। এখন যদি এই পরিবর্তনকে সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করি তাহলে বলতে হয়, প্রতিক্ষণে শরীরের বৃদ্ধি স্বীকার করলে, পরবর্তী ক্ষণগুলিতে পূর্বক্ষণের শরীরের বিনাশ মানতে হয়, অর্থাৎ যেক্ষণে একটি শরীরের নাশ হয়, সেই ক্ষণেই আর একটি অনুরূপ শরীরের উৎপত্তি ঘটে। তাহলে স্বীকার করতেই হবে প্রতিটি ক্ষণের শরীর পূর্বপূর্ব ক্ষণের শরীর থেকে পৃথক। বৌদ্ধরা বলেন, শরীরের ক্ষণিকতা যে কোন সৎ বস্তুরই ক্ষণিকতা প্রমাণ করে।

প্রাচীন বৌদ্ধগণ আরও বলেন, কেউ হয়ত এইক্ষেত্রে বলতে পারেন, শরীরের ক্ষেত্রে না হয় ক্ষণিক সত্তা বা পরিবর্তন স্বীকার করা গেল, কিন্তু প্রস্তর খণ্ড বা লৌহ খণ্ড প্রভৃতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন প্রত্যক্ষযোগ্য নয়। তাই এগুলি স্থায়ী পদার্থ বলে স্বীকার করতে হবে। কিন্তু এর উত্তরে প্রাচীন বৌদ্ধরা বলেন, তা বলা যায় না। কারণ, তাঁরা উদাহরণ দিয়ে বলেন, দুগ্ধের বিনাশ থেকে দধির উৎপত্তি হয়। এটি আমরা সকলেই স্বীকার করি। কিন্তু দুগ্ধের বিনাশ যে দধি উৎপত্তির কারণ এটি প্রত্যক্ষযোগ্য নয়। কিন্তু তাই বলে কেউ এদের বিনাশ ও উৎপত্তি অস্বীকার করে না। একই যুক্তি প্রস্তর বা লৌহ খণ্ডের ক্ষেত্রেও বলা যায়। পরিবর্তন প্রত্যক্ষযোগ্য নয় বলে তাদের ক্ষণিক সত্তা অস্বীকার করা যায় না। এই যুক্তি থেকে প্রাচীন বৌদ্ধ দার্শনিকদের সিদ্ধান্ত হল, প্রত্যেক সৎ বস্তু প্রতিক্ষণে অনুরূপ একটি বস্তু উৎপন্ন করে বিনষ্ট হয়। তাই তাঁরা বলেন যা সৎ তাই ক্ষণিক।

নব্য বৌদ্ধ দার্শনিকগণও বলেন, 'সর্বং ক্ষণিকং সত্তাৎ'। কিন্তু তাঁরা বিষয়টিকে প্রাচীন বৌদ্ধ দার্শনিকদের দেওয়া যুক্তি থেকে ভিন্ন যুক্তির সাহায্যে বিষয়টিকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। সমসাময়িককালে 'ক্ষণিকত্ববাদ' বিরোধী 'দ্রব্যের নিত্যতাবাদ' দর্শন জগতে প্রভাব বিস্তার করেছিল। 'নিত্যতাবাদ'-এর আগ্রাসী মনোভাব থেকে ক্ষনিকত্ববাদকে রক্ষা করার জন্য নব্য বৌদ্ধরা এক বিশেষ যুক্তির অবতারণা করেন। যে যুক্তির সাহায্যে নব্যগণ ক্ষণিকত্ববাদকে দর্শন জগতে দৃঢ়তার সঙ্গে স্থাপন করতে চেয়েছেন তা হল - 'অর্থক্রিয়াকারিত্ব-লক্ষণম্-সৎ' অর্থাৎ নব্য বৌদ্ধদের মতে, যা সৎ তা অর্থক্রিয়াকারী অর্থাৎ তার কার্যোৎপাদন ক্ষমতা আছে। তাঁরা বলেন, একমাত্র সৎ বস্তুর পক্ষে কার্য উৎপাদন করা সম্ভব, অসৎ-এর পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। যেমন ঘট, পটাদির ন্যায় কোন সৎ বস্তু আমাদের কোন না কোন প্রয়োজন সাধন করে। যেমন ঘটের দ্বারা জল আনয়ন করা যায়, পটের দ্বারা লজ্জা নিবারণ করা যায় ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আকাশকুসুম, শশশৃঙ্গ ইত্যাদি অসৎ বস্তু কোন প্রয়োজন সাধন করে না অর্থাৎ এদের কার্য উৎপাদন ক্ষমতা নেই, তাই এরা অসৎ।

বীজের দৃষ্টান্তের সাহায্যে নব্য বৌদ্ধরা ক্ষণিকত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বলেন, বীজ সদ্বস্তু। তার কাজ অঙ্কুরোৎপাদন করা এবং সে তাই করে। নব্য বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বলেন, নিত্যতাবাদীদের বক্তব্য অনুযায়ী বীজ নিত্য ও স্থায়ী দ্রব্য হলে, তার পক্ষে অঙ্কুরোৎপাদন সম্ভব হত না। বীজের কার্যোপাদন (অঙ্কুরোৎপাদন) ক্ষমতাই প্রমাণ করে বীজ স্বরূপতঃ ক্ষণিক। যদি বলা হয় স্থায়ী বীজই অঙ্কুরোৎপাদন করে, তাহলে বলতে হয় ঘরের বীজের অঙ্কুরোৎপাদন করা উচিৎ। যেহেতু বীজ স্থায়ী দ্রব্য, সেহেতু ঘরের ও মাঠের বীজ একই হওয়া উচিৎ। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় মাঠের বীজই অঙ্কুরোৎপাদন করে, ঘরের বীজ তা পারে না। এক্ষেত্রে নিত্যতাবাদীগণ বলতে পারেন; জল, আলো, বাতাস প্রভৃতি সহকারী কারণের উপস্থিতির জন্য মাঠের বীজ অঙ্কুরোৎপাদন করতে পারে।

কিন্তু ঘরের বীজের ক্ষেত্রে তা না থাকার জন্য অঙ্কুরোৎপাদন করতে পারে না। উত্তরে নব্য বৌদ্ধগণ বলেন, তাহলে বলতে হয় অঙ্কুরোৎপাদন শক্তি (কার্যোৎপাদন শক্তি) বীজের স্বাভাবিক ধর্ম নয়। কিন্তু যদি তাই হয় তাহলে বীজের পক্ষে কোন সহকারী কারণের সাহায্যেও অঙ্কুরোৎপাদন করা সম্ভব হবে না। যেমন প্রস্তর খণ্ডের অঙ্কুরোৎপাদনের স্বাভাবিক ধর্ম না থাকায় জল, আলো, বাতাস প্রভৃতি সহকারী কারণের উপস্থিতিতেও তা অঙ্কুরোৎপাদন করতে পারে না। সুতরাং মানতেই হয় স্থায়ী বস্তুর পক্ষে কার্যোৎপাদন করা সম্ভব নয়। কারণ, তা অর্থক্রিয়াকারী হতে পারে না। ক্ষণিক দ্রব্যই অর্থক্রিয়াকারী হতে পারে। কাজেই যা অর্থক্রিয়াকারী, তাই সৎ। আর যা সৎ, তাই ক্ষণিক।

নব্য বৌদ্ধ দার্শনিকগণ স্থিরদ্রব্যবাদীদের আরও কতকগুলি অভিযোগ উত্থাপন করে তা খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা এই প্রসঙ্গে বলেন, সহকারী কারণের সাহায্যেই যদি বীজ অঙ্কুরোৎপাদন করে, তাহলে সহকারী কারণকে অঙ্কুরোৎপাদনরূপ কার্যের কারণ বলা উচিৎ। যেহেতু সহকারী কারণজন্য শক্তি অঙ্কুরোৎপাদনরূপ কার্য জন্মায়। কিন্তু পূর্বেই প্রমাণ হয়ে গেছে তা সম্ভব নয়। তাই এক্ষেত্রে 'সহকারী কারণ' কথাটি অনর্থক। এছাড়াও 'সহকারী কারণ' স্বীকার করলে আরও সমস্যার সৃষ্টি হয়। কোন কার্যের বহু কারণের মধ্যে কোন্‌টি মুখ্য, কোন্‌টি গৌণ তা নিরূপণ করা কঠিন। তাছাড়া যে কারণের স্বভাবে কার্য উৎপাদন শক্তি নেই, তা শত সহকারী কারণের সাহায্যেও কার্য উৎপাদন করতে পারে না।

অবশেষে নব্য বৌদ্ধরা বলেন, বীজ অঙ্কুরের কারণ হলেও একমাত্র কারণ নয়। যে বীজ অঙ্কুরোৎপাদনে সমর্থ তার একটি বিশেষ শক্তি স্বীকার করতেই হয়। যার নাম বৌদ্ধ দার্শনিক পরিভাষায় ‘কুর্বদ্রূপতা’। তাঁরা বলেন, মাঠের বীজের অঙ্কুরোৎপাদনের অব্যবহিত পূর্বক্ষণে ‘কুর্বদ্রূপতা’র সঞ্চার হয়, যা ঘরের বীজে হয় না। তাই ঘরের বীজে প্রতিক্ষণে পরিবর্তন ঘটলেও ‘কুর্বদ্রূপতা’র সঞ্চার না হওয়ায় অঙ্কুরোৎগম্ হয় না। যার জন্য পূর্ব পূর্ব ক্ষণের অতি সূক্ষ্ম পরিবর্তনও আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। কিন্তু ‘কুর্বদ্রূপতা’ থাকার জন্য মাঠের বীজের পরিবর্তন আমরা বুঝতে পারি।

প্রকৃতপক্ষে ঘরের বীজ ও মাঠের বীজ সবই ক্ষণিক। প্রতি ক্ষণের বীজ অব্যবহিত পরবর্তীক্ষণে অনুরূপ একটি বীজ উৎপন্ন করে নিজে ধ্বংস হয়ে যায়।। প্রতিটি সৎ বস্তু একটি ক্ষণমাত্র স্থায়ী হয় এবং বিলুপ্তিকালে অনুরূপ বস্তু উৎপাদন করে। নব্য বৌদ্ধরা আরও বলেন, যাকে স্থির দ্রব্য বলে মনে হয়, তা প্রকৃতপক্ষে অসংখ্য সদৃশ ও অর্থক্রিয়াকারী ক্ষণিক সন্ততিরই প্রবাহ। প্রতিটি সন্ততি যে ক্ষণে উৎপন্ন হয়, তার পরবর্তীক্ষণেই বিনষ্ট হয়। যা সৎ তা অর্থক্রিয়াকারী বলে ক্ষণিক। আর এইভাবেই নব্য বৌদ্ধ দার্শনিকগণ সৎ বস্তুর লক্ষণ থেকেই ক্ষণিকত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন।

সমালোচনা ঃ বৌদ্ধদের ক্ষণিকত্ববাদের বিরুদ্ধে অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিকগণ নানাভাবে সমালোচনা করেছেন।

ক্ষণিকত্ববাদের বিরুদ্ধে জৈনদের যুক্তি হল ক্ষণিকত্ববাদ স্বীকার করলে বিভিন্ন ক্ষণে ব্যক্তি সত্তার পরিবর্তনের ফলে ব্যক্তির কৃতকর্মের ফলভোগের ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না অর্থাৎ কর্ম করার পর সেই ব্যক্তি ভিন্ন ব্যক্তিতে পরিণত হওয়ার জন্য সে ফলভোগ করবে না। পরন্তু দ্বিতীয়ক্ষণে যে ব্যক্তি সত্তার সৃষ্টি হল তাকে পূর্ব ক্ষণের ব্যক্তির কৃতকর্মের ফলভোগ করতে হবে। আবার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই যদি মোক্ষ হয়, তাহলে তাও ক্ষণিকত্ববাদ স্বীকার করলে সম্ভব হবে না। কারণ দুঃখও তো ক্ষণিক হয়ে যাবে। ক্ষণিকত্ববাদের জন্য মোক্ষ প্রয়াসী ও মোক্ষ প্রাপ্ত ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন হবে। তাই মোক্ষ সম্ভব হবে না।

দ্বিতীয়ত ঃ জৈনদের মতে ক্ষণিকত্ববাদের দ্বারা স্মৃতির ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। কারণ স্মৃতির জন্য পূর্ব প্রত্যক্ষিভূত বিষয়ের সংরক্ষণের এবং পরবর্তীকালে সেই সংরক্ষিত বিষয়ের অবিকল পুনরুদ্রেক প্রয়োজন। কিন্তু তার জন্য স্থায়ী ব্যক্তি সত্তার স্থায়ী মনের স্বীকার করতে হবে। কিন্তু বৌদ্ধ মতানুযায়ী জ্ঞাতা মন পরিবর্তন প্রবাহ (বিজ্ঞান প্রবাহ), কোন স্থায়ী সত্তা নয়। তাই স্মৃতিও সম্ভব নয়। একই কারণে প্রত্যভিজ্ঞাও সম্ভব নয়। আবার ক্ষণিকত্ববাদ স্বীকার করলে জ্ঞানেরও ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। কারণ, ক্ষণিকত্ববাদ অনুসারে যখন জ্ঞানের অস্তিত্ব থাকবে, তখন জ্ঞেয় বিষয়ের অস্তিত্ব থাকবে না, আবার যখন জ্ঞেয় বিষয়ের অস্তিত্ব থাকবে, তখন জ্ঞানের অস্তিত্ব থাকবে না।। ফলে কোন বিষয়ের জ্ঞান সম্ভব হবে না।

ক্ষণিকত্ববাদের বিরুদ্ধে নৈয়ায়িকদের আপত্তি হল, ক্ষণিকত্ববাদ স্বীকার করলে অনবস্থা দোষ ঘটবে। কারণ তাঁদের মতে যা সৎ তা অর্থক্রিয়াকারী বলে ক্ষণিক - এই যুক্তি স্বীকার্য নয়। কারণ, অর্থক্রিয়াকারিত্ব অর্থাৎ কার্য উৎপাদন ক্ষমতা সত্তার লক্ষণ হতে পারে না। কোন বস্তুর যে ঐ সামর্থ আছে তা কার্য উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে বলা যাবে না। আবার সেই বস্তুটিও যে সৎ তা তার কার্য উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে জানা যাবে না। আর এইভাবে চলতে থাকলে পরিণাম অনবস্থা দোষ। এছাড়াও কোন স্থায়ী দ্রষ্টা না থাকলে বস্তুর ক্ষণিকত্ব বোধগম্য হয় না।

তবে নব্য বৌদ্ধগণ এই সমালোচনার উত্তরে বলেন, অর্থক্রিয়াকারিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। কারণ একে অস্বীকার করাও এক প্রকার অর্থক্রিয়াকারিত্ব। আসলে নৈয়ায়িকগণ অর্থক্রিয়াকারিত্বকে অস্বীকার করেন নি। তাঁরা কেবল অর্থক্রিয়াকারিত্বের উপলব্ধি অস্বীকার করেছেন। কিন্তু অর্থক্রিয়াকারিত্ব ও তার জ্ঞান এক বিষয় নয়। তাই বলতে হয় অর্থক্রিয়াকারিত্ব সত্তার লক্ষণ।

ক্ষণিকত্ববাদের বিরুদ্ধে আচার্য শংকর বলেন, আত্মা যদি স্থায়ী না হয়ে ক্ষণিক বিজ্ঞান প্রবাহ হয়, তাহলে জ্ঞান সম্ভব নয়। কারণ পরিবর্তনশীল জ্ঞাতার পক্ষে পরিবর্তনশীল জ্ঞেয় বিষয়ের জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। পরিবর্তনশীল জ্ঞেয় বিষয়ের জ্ঞানের জন্য স্থায়ী জ্ঞাতার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে।

আবার ক্ষণিকত্ববাদ কার্য-কারণ সম্পর্কের বিরোধী মতবাদ। একমাত্র স্থায়ী কারণের পক্ষে কার্য উৎপাদন সম্ভব। কারণ যদি ক্ষণকাল স্থায়ী হয় এবং পরমূহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায়, তাহলে তার পক্ষে কোন কার্য উৎপাদন সম্ভব নয়। যেহেতু কার্যের জন্য কারণকে অস্তিত্বশীল হতে হবে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে ক্রিয়া করতে হবে। কারণ ক্ষণিক হলে কোন্ কারণ থেকে কোন্ কার্য উৎপন্ন হচ্ছে তা বলা যাবে না বা বলতে হবে যে কোন কার্য যে কোন কারণ থেকে উদ্ভূত। যা প্রকৃতপক্ষে সম্ভব নয়। তাই ক্ষণিকত্ববাদ গ্রহণযোগ্য নয়।

জৈনদের দ্বিতীয় সমালোচনার উত্তরে বৌদ্ধগণ বলেন, বুদ্ধদেব পরিবর্তন প্রবাহের মূলে কোন স্থায়ী সত্তাকে স্বীকার না করলেও ধারাবাহিকতাকে স্বীকার করেছেন। আর তার ফলে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষিত হয়।। পূর্বক্ষণের সংস্কার থেকেই বর্তমান ক্ষণের উৎপত্তি। পূর্বক্ষণের অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিত্ব থেকেই উৎপন্ন বর্তমান ক্ষণের অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিত্ব। কাজেই পূর্বক্ষণ ও বর্তমান ক্ষণের ব্যক্তি ও বস্তু সম্পূর্ণ এক না হলেও সম্পূর্ণ ভিন্ন ও নয়। তারা পরস্পর সদৃশ। পূর্বক্ষণের সংস্কার পরবর্তীক্ষণগুলিতে সঞ্চারিত হওয়ায় স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞার ব্যাখ্যা দিতে কোন অসুবিধা হয় না।

পরিশেষে একথা বলা যায় যে, বৌদ্ধ স্বীকৃত ক্ষণভঙ্গবাদের বিরুদ্ধে যতই সমালোচনা করা হোক না কেন প্রাচীনকালে দর্শন আলোচনার জগতে বৌদ্ধ দার্শনিকদের ব্যাখ্যা কত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ছিল তা তাঁদের ক্ষণভঙ্গবাদের আলোচনাতে স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়, যা ভারতীয় দর্শন ও চিন্তাধারার জগতে এক বিশেষ মর্যাদার দাবী রাখে।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ